ডান হাতের শক্তি ও শিহরণ

সাদ কামালী

‘কে কোনখানে ঘুমোন সেটা একেবারেই গৌণ,
দেখব তিনি কোথায় জেগে, কোথায় নন মৌন,
কোথায় ভাঙেন শিকল, বাঁধেন ভাইয়ের হাতে রাখী
মনের কথা মুখে আনতে করেন পরোয়া কী ?
তিনি কোথায় ঘুমোন সেটা আমার চোখে বাহ্য
কোথায় জেগে আছে তাই একমাত্র গ্রাহ্য।’
—জাগ্রত, সুভাষ মুখোপাধ্যায়

শীতের রঙ ধরা পাতার মতো নীরব ম্রিয়মান হাসি ঠোঁটের চারপাশে জড়িয়ে রেখে নির্বাহী পরিচালক আশফাক খানের কি করতে হবে কি করতে হবে না উপদেশ শুনতে শুনতে হিসাব কর্মকর্তা জামাল চৌধুরীর ডান হাতের আঙুলে, তালুতে কেমন শিরশির অনুভূতি হয়, শরীর কাঁটা দিয়ে ওঠে, মুঠা পাকায়, মুঠা খোলে, মুখে তার ছায়া পড়ে না। অন্যদের আড়ালে জামাল চৌধুরী চোখ বুঁজে থেকে ডান হাতের এই অনুভূতি অনুভব করে, ভয় পায়, হাত ঝাড়া দেয়, বারবার ধোয়, সাবান দিয়ে মেলা পানিতে ধোয়, তবুও হাতে যেন কিসের স্স্পর্শ অনুভূতি, ভেজা, নরম, মিহি আঁশের ছোঁয়ায় শরীর কেঁপে ওঠে। এমন শিহরণ জাগা সময়ে জামাল চৌধুরী কলমও ধরতে পারে না। কোনো কিছুই না। অথবা যা সে ধরে তার ইহজন্ম শেষ ! অন্যদের আড়ালে চোখের সামনে হাত তুলে দেখে, গন্ধ শুঁকে, ভেজা আঠা আঠা কিছু খোঁজে। আঙুলে, তালুতে পাতলা নরম নরম পশমের অনুভূতি ! কোথায়, হাতে তো কিছু লেগে নাই ! জামাল চৌধুরী প্যান্টের পকেটের ভিতর হাত ঢুকিয়ে ডলে। আশফাক খান বলে, সময়ের আগেই কাজ শেষ করে ফেলবেন।
জি স্যার।
শুনেন, ছোটখাটো সমস্যাকে অবহেলা করবেন না, সমস্যাকে উপেক্ষা করলেই বিপদ। ছোট একটা ফিউজের সূক্ষ্ম একটা তার হাজার টনের পাওয়ার প্ল্যান্ট বন্ধ করে দিতে পারে।
জামাল চৌধুরী দীর্ঘশ্বাস গোপন করতে পারে না। আশফাক খানও নিজের কথা শেষ করে লম্বা শ্বাস ফেলে। জামাল চৌধুরী নরম কণ্ঠে বলে, ভুল করলেও সময়মতো সব ঠিক হয়ে যায়। আশফাক খান ভুল ঠিক নিয়ে আর কথা না বাড়িয়ে জামাল চৌধুরীকে বিদায় করে, ঠিক আছে, আপনি এখন আসেন। জামাল চৌধুরী ঘুরে দরজা ঠেলে বের হওয়ার মুখে আশফাক খান বলে, আপনার হাতে কোনো সমস্যা আছে ? সহসা জামাল চৌধুরীর চোখে পানি ভাসে, ঠোঁটে হাসি ম্রিয়মান, মাথা দুইদিকে দুলিয়ে জানায় কোনো সমস্যা নাই। আশফাক খান বলে, একটা কথা মনে রাখবেন, ভুল করলেও সময়মতো সকলেরই ঠিক হয়ে যায় না। বাকি জীবনেও পারে না। জামাল চৌধুরী মাথা নিচু করে বের হয়ে আসে।

মতিঝিল সোনালী ব্যাঙ্কের সামনে থেকে পিক-আপ ভ্যান ‘ম্যাক্সি’র পিছনে হাঁটু ভাঁজ করে বসেও পাশের রড শক্ত করে চেপে ধরে। পাশের লোকটি এত ভিড়, শব্দ, ধুলা, গাড়ির হর্ণের ভিতর বারবার ঘুমিয়ে পড়ছে। একবার হাত দিয়ে মাথা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে জামাল চৌধুরী চমকে ওঠে। পাতলা হয়ে আসা খুব নরম চুলের স্স্পর্শে শিরশির অনুভূতি শরীরে ঝাঁকি দিয়ে ওঠে। লোকটি তখনি মাথা সরিয়ে না নিলে জামাল চৌধুরী হয়তো এমন করে চেপে ধরত যে মাথার খুলি গুড়া হয়ে মগজে সেঁধিয়ে যেত, তবুও হাত সরিয়ে আনতে পারত না। সারা শরীরে কেমন অনুভূতি নিয়ে ম্যাক্সির ভিতর জামাল চৌধুরী কুঁকড়ে বসে থাকে। তার ডান হাতে শক্ত করে চেপে ধরা রড সে ছাড়ছে না। এটি রড না হয়ে যদি বিড়ালের পেট বা

গলা হতো, মোরগের গলা হতো ! অবশ্য মোরগ মুরগি বা নরম পশমযুক্ত কোনো কিছুই সে আর স্পর্শ করে না। বাজার থেকে আলী মুরগি বা মোরগ জবাই করে কেটে বেছে আনে। জীবন্ত নিয়ে এলেও আলী আর জামাল মামাকে বলবে না, মামা মাথাডা এমায় টাইনা ধরেন, আমি জবাই করবার লাগছি। জামাল ধরেও ছিল, হাতের ভিতর পশমের নরম গরম স্পর্শে সব গোলমাল করে দিল। আলী কিছু বুঝবার আগে জামাল চৌধুরী এমন জোরে মুরগির গলা মাথা চেপে ধরে যে আলীকে আর বিসমিল্লাহ বলে জবাই করতে হয় না, তার আগেই ইহলীলা সাঙ্গ করে ফেলে। আলী চমকে দেখেছিল, জামাল মামার চোহে এ্যাহাবারে রক্ত আইয়া পড়ছে, শরীল জানি কেমুন করে। তবুও আলী সদ্য মরা মুরগিই আবার জবাই করে জবাই সংস্কার পালন করে নেয়। জামাল চৌধুরী অবশ্য আর ওই মাংস খায়নি।

রাতে বিছানায় লেপের তলে বিড়াল এসে শোয়, দুই একবার পা দিয়ে সরিয়ে দিলেও সরে না, আবার গা ঘেষে শোয়। পাশে সায়মা আধা ঘুম জাগরণের ভিতর পড়ে আছে। রান্নাঘর আর বসার ঘরের মাঝখানের সরু করিডোরে আলী ঘুমিয়ে। আলী মশারি টাঙ্গালেও বাইরের থেকে ভিতরে বেশি মশা। ঘুমের ভিতরেই মশা তাড়ায়। সব আলো বন্ধ থাকলেও খোলা জানালা দিয়ে রাস্তার আলো এসে অন্ধকার তত জোরালো করে তোলেনি। জামাল চৌধুরী উঠে বসে এক হাতে বিড়ালের ঘাড় ধরে বাইরে ছুড়ে ফেলার জন্য উঁচু করে, অন্য হাতে মশারি তোলে। কিন্তু বিড়াল আর ছুড়ে ফেলতে পারে না। নরম মিহি পশমের কোমল স্পর্শে জামাল চৌধুরীর শরীর কেঁপে ওঠে। সে আরও শক্ত, শরীরের সকল শক্তি দিয়ে বিড়ালের গলা চেপে ধরে। বিড়াল হাত পা দিয়ে আঁচড়ে দেয়, শরীর মোচড়ায়, জিব বেরিয়ে আসে, চোখে ঠোঁটে রক্ত জমে তবুও ছাড়ে না। বিড়ালের ছটফটানি আর অস্পষ্ট গোঙ্গানির আওয়াজ সায়মার অস্বস্তি লাগে, বমি বমি ভাব হয়, হাত দিয়ে জামাল চৌধুরীকে ঠেলা দেয়। জামাল চৌধুরী হুঁশ ফিরে পেলেও বিড়ালটাকে ছাড়তে পারে না। চোখে ভয়, অস্থিরতা, অন্ধকারে দেখা যায় না কত রক্ত জমেছে। বিড়বিড় করে বলে, আর একটু আর একটু সহ্য করো বউ। সায়মা এবার জোরে ঠেলা দেয়, যদিও বিড়াল আর ছটফট করছিল না, সেই শক্তির অতিত সাদা আদুরে বিড়ালটি।

ম্যাক্সি রড ধরে বাইরে তাকিয়ে কোনোরকমে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে চেষ্টা করে। এবার ঘুমিয়ে পড়া লোকটি ঘুমের সমাপ্তি ঘটিয়ে বিস্ময় চোখে জামাল চৌধুরীকে দেখছে। জামাল চৌধুরী লোকটিকে বলে, আপনার মাথাটা কচি শিশুর মতো নরম। লোকটির চোখে তখনও বিস্ময়, বলে, আপনার শরীর ভালো আছে তো ? জামাল চৌধুরী মুখে হাসি ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করে। রডও ছেড়ে দেয়। হাতের তালুতে রডের দাগ বসে রক্ত আর রক্ত শূন্যতার ছবি ফুটে উঠেছে। চোখ লাল, কপাল চিবুক ঘামে ভেজা। সত্যিই ভাই আপনার মাথা এমন নরম, মায়ের পেটের শিশুর মতো নরম। লোকটি মনে মনে বলে, মাথা আওলাই গেছে। মুখে বলে, খুব গরম তো, কোথায় যাবেন ? জামাল চৌধুরী বলে, লেক সার্কাস কলাবাগান। লোকটি এবার অন্যদের দিকে দ্রুত চোখ ঘুরিয়ে এনে বলে, শরীর খারাপ থাকলে একলা চলাফেরা করবেন না কেমুন।

জামাল চৌধুরী বাসা পর্যন্ত পৌঁছতে পৌঁছতে স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। বাস স্ট্যাণ্ড থেকে হেঁটে বাসায় আসবার পথে 'মামা হালিম' কিনে নেয় সায়মার জন্য। নীল পাড় সাদা শাড়ি সাদা ব্লাউজ পরে তিনতলার গ্রিলঘেরা বারান্দায় চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছে সায়মা। পিছন থেকে আলীর মা কাঁচাপাকা চুলের ভিতর বিলি দিয়ে দিয়ে তেল বসিয়ে দেয়। আছর ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাওয়ার পথে। আলো কমে আসার সঙ্গে সঙ্গে মশারও উপদ্রব বাড়ছে। জামাল চৌধুরী মাটির খোরায় মামা হালিম চামচ সহ এনে সায়মার হাতে দেয়। সায়মা একবার চোখ তুলে, চোখে প্রসন্নতা। জামাল চৌধুরী বলে, তুমি খাও, আমি পানি খাবো, হালিম খেলে আবার বুক জ্বলবে। সায়মা তবুও চামুচে হালিম তুলে এগিয়ে ধরে। জামাল চৌধুরী তখন বাধ্য হয়েই মুখে নেয়। পরপর তিনচামুচ সায়মার হাতে খেয়ে বলে, দেও আমি তোমাকে খাইয়ে দিই। আলীর মা পিছনে সরে দাঁড়িয়েছিল, এখন রান্নাঘরের উদ্দেশে যেতে যেতে বলে, ভাইজান আফনি আফার ধারে বসেন, আমি চা বানায় দিবার লাগছি। জামাল চৌধুরী বসে মরিচ, হাড্ডি, ধনেপাতা সরিয়ে সরিয়ে চামুচে তুলে সায়মাকে খাইয়ে দেয়। সায়মার ঠোঁটে

চিবুকে সন্ধ্যার বিষণ্ণতার সঙ্গে নরম একটা হাসি জড়ানো। জামাল চৌধুরী বলে, জানো, আসার সময় ম্যাক্সির মধ্যে এক লোক আমার কাঁধে বারবার মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ছিল। সায়মার চোখে এই গল্প শোনার আগ্রহ নাই। তার চোখ খোরার হালিমে। জামাল চৌধুরী বলে যায়, লোকটার মাথা ঠেলে সরাতে যেয়ে চমকে উঠি, এমুন নরম, কচি মাথা বয়স্ক লোকের হয় ? সায়মা তখন মুখের খাবার গিলে চমকে তাকায়, তার চোখে ভয়। জামাল চৌধুরী দ্র"ত বলে, না না লোকটা নিজেই মাথা সরিয়ে ফেলে, আমি ওর মাথা ঠেসে ধরতে পারিনি। সায়মা এবার হালিমের খোরা নিয়ে উঠে যায়। মাগরেবের আজান শুর" হয়ে গেছে চারপাশ থেকে। চারকোণা গ্রিলের ভিতর দিয়ে পশ্চিমের রঙিন আকাশ যতটুকু দেখা যায় ততটুকুই তাকিয়ে দেখে। ছেঁড়াখোড়া কিছু মেঘ লালচে কমলা দিগন্তের ওপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, হঠাৎ হঠাৎ পাখি উড়ে যায়, কোথাও টায়ার বার্স্ট হওয়ার শব্দ, গাড়ির হর্ণ, আলী চিৎকার করে ডাকে, মামা ঘরে ডুহেন, দরজা দিবো, বেবাক মশা কিন্তুক ডুকপার লাগছে। জামাল চৌধুরী বারান্দার চেয়ার থেকে উঠতে যাওয়ার মুখে আশফাক খানের কথা মনে হয়, বারবার কেন সে আমাকে ডেকে কথা বলে ! অনুতপ্ত ! না নিজের ক্ষমতা দেখায় ! অনুতপ্ত কেন হবে, কোরআন ছুঁয়ে তো বলেছে সে খবর দেয়নি, বরং বাঁচিয়েছে। সে যদি না থাকতো তবে ঠিকই খুঁজে খড়ির ঘর থেকে জামাল কামাল দুই ভাইকে ধরে নিয়ে যেত, অন্তঃসত্ত্বা সায়মাকেই কি রেহাই দিতো, যতই শেষ সময় হোক। গণিমতের মাল আর কে বাছাই করে ! জামাল কামাল পরে ভেবে দেখেছে, শুনেছেও। আশফাক হারামিই কামালের খবর জানিয়ে এসেছিল ক্যাম্পে। খড়ির ঘরের কথা সে তখন খেয়াল করেনি। এদিকে মিলিটারিরও আরও একটা অপারেশনে যাবার তাড়া ছিল, আরও সময় ধরে খুঁজলে উঠানের মাথায় ভাঙ্গা হলেও, দরজা খোলা থাকলেও খড়িঘরে খুঁজে দেখতে পারত, নিদেন পক্ষে সেমি-মেশিনগানের কিছু বুলেট দিয়ে ঝাঁঝরা করে ফেলতে পারত ওই ঘর, অথবা আগুন লাগাতেই বা কতক্ষণ, তখন ঘর পোড়ার মধ্যে দুই ভাই, অন্তঃসত্ত্বা সায়মা আলু পোড়া হয়ে ছাইয়ের গাদা হয়ে মিশে যেতে পারত।

জামাল চৌধুরী ডান হাত কাঁধ থেকে কেমন ঝুলিয়ে ঘরে ঢোকে। বাতির নিচে হাতের আঙুল, করতল দেখে। মধ্যমার নিচে ছোট একটা লালচে তিল, এই তিল থাকলে কি হয় ! ঠোঁট ঘিরে হাসি ফোটে, মা বলেছিল, তোর হাতে রান্না ভালো হবে। রান্না ! এক গ্লাস পানি খেতে হলেও আলী-গংদের জন্য অপেক্ষা করতে হয়। জীবনে একবার চা বানিয়ে খাওয়ারও অভিজ্ঞতা হলো না। এক বেডর"মের এ্যাপার্টমেন্ট হলেও খুব ছোট বাসা নয়। বসার ঘরে কালো রঙের ওয়াল ইউনিটের ভিতর কুড়ি ইঞ্চি রঙিন টেলিভিশনে স্থানীয় সংবাদ হ"ছে। টেলিভিশনের ওপরে তিন চারটা চিঠি। তার মধ্য থেকে কামালের চিঠি হাতে নিয়ে সোফায় বসে বলে, আলী এক কাপ লাল চা দিয়ে যা বাবা। জামাল চৌধুরী চিঠি খোলার আগে গন্ধ শুঁকে, বিদেশের চিঠির একরকম গন্ধ আছে। চওড়া সুদৃশ্য টিকিটের দিকে তাকিয়ে লম্বা শ্বাস ফেলে চিঠি খোলে। ছোটবেলায় কামাল ডাক টিকিট সংগ্রহ করত, তখন এমন একটা সুন্দর টিকিটের জন্য কামাল সবকিছু ত্যাগ করতে রাজি ছিল। সুযোগ বুঝে জামাল কতদিন ওর পাত থেকে সিদ্ধ ডিমের গোটা কুসুমটাই আত্মসাৎ করে ফেলেছে। রাতে এক বিছানায় শুতে এসে না ঘুমানো পর্যন্ত পাখার বাতাস, মায় মাথা টেপার সার্ভিসও টিকিটের লোভ দেখিয়ে আদায় করে নিয়েছে। পেনফ্রেণ্ডের চিঠি আসত অস্ট্রেলিয়ার সিডনি, আমেরিকার ফ্লোরিডা, ক্যালিফোর্ণিয়া থেকে। আর এখন ! কামালই কত সুন্দর ডাক টিকিট লাগিয়ে মন্ট্রিয়ল থেকে চিঠি পাঠায়। ফোনে কথা হয় সব সময়। তারপরও কত কথা লিখে কামাল চিঠি ডাকে পাঠায়। চিঠি সংস্কৃতির ক্রান্তিকালে কামালই যা ব্যতিক্রম। আলী চা টোস্ট বিস্কুটের সঙ্গে ছোলাভুনা দিয়ে বলে, আইজ মামী পাকায়ছে, খাইয়েন মামা। এখন ছোলা খাবার ই"ছা না হলেও সায়মার জন্য খেতে হবে। কিন্তু চিঠি পড়তে শুর" করে জামাল চৌধুরী উত্তেজনায় ছোলা খেতে পারে না। দৌড়ে সায়মার কাছে শোওয়ার ঘরে আসে, কামাল আসতেছে, সবাইকে নিয়েই আসবে। সায়মা উঠে বসে লম্বা শ্বাস ফেলে। কামালের দুটি মেয়ে, হাই স্কুল শেষ করে এই বছরই কনকর্ডিয়া ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছে। জমজ মেয়ে হলেও চেহারার মিল সামান্য, কেউ বলে না দিলে বলতেই পারবে না শুভ্র এবং করবি একই বৃন্তের দুই রূপের ফুল। শুধু একটাই মিল, দুজনই সুন্দর। মায়ের কোঁকড়া চুল ফর্সা রঙ নিয়ে শুভ্র তার নামের মতোই, বাবার শ্যামলা রঙ সোজা চুল নিয়ে করবির মতো স্নিগ্ধ করবি। সায়মা মনে

মনে ভয় পায়, জামাল ওদের ধরে আদর করতে যেয়ে কোনো বিপদ না ঘটায়। ইস্কাটন প্লাজায় কফি শপে বসে জামাল চৌধুরী সায়মা কফি আর প্যাটিস খাচ্ছিল। পাশের টেবিলের ছোট একটা ছেলে হাতে বল নিয়ে খেলছে, আর ওদের দেখছে। জামাল চৌধুরী মুখে হাসি নিয়ে ছেলেটিকে দেখে। সায়মা তেমন দেখে না। কফির ধোঁয়ার ভিতর নিজের লম্বা শ্বাস ছেড়ে অন্য দিকে তাকিয়ে থাকে। ছেলেটির বল এক সময় জামাল চৌধুরীর পায়ের কাছে চলে এলে হাত দিয়ে তুলে ছেলেটিকে এগিয়ে দেয়। ছেলেটির বাবা বলে, আঙ্কেলকে থ্যাঙ্ক-উ বলো। ছেলেটি থ্যাঙ্ক-উ না বলে লাজুক হাসে। তখন ওকে আরও সুন্দর মিষ্টি লাগে। জামাল চৌধুরী বলে, ঠিক আছে তোমাকে থ্যাঙ্ক-উ বলতে হবে না বাবা, বলে মাথায় আদর করে দেয়। ছেলেটিও আদর টানতে জানে। মাথা এলিয়ে দেয় জামাল চৌধুরীর ওপর। জামাল চৌধুরীর হাত ছেলেটির মাথার নরম মসৃণ চুলে বিলি দিতে দিতে কেমন থেমে যায়, হাত শিরশির করে ওঠে, পাঁচ আঙুল করতল দিয়ে ছেলেটির মাথার মাঝখানে গায়ের শক্তিতে চেপে ধরে। জামাল চৌধুরীর হাতের শিরা ফুটে ওঠে, চোখ লাল, চিবুক লাল, শরীর কাঁপে, তবুও ছাড়ে না। এর মধ্যে ছেলেটি হাতপা ছুড়তে ছুড়তে থেমে গেছে। সায়মা মুখে একরকম গোঙ্গানি এনে জামাল চৌধুরীকে টেনেও সরাতে পারে না। ছেলেটির বাবা শেষে কি করবে বুঝতে না পেরে হাতের ওপর গায়ের শক্তিতে কামড় বসিয়ে দেয়। ডান হাতের কব্জির ওপরে কামড়ের সেই দাগ এখনো আছে। শমরিতা হাসপাতালে এক ঘণ্টার পর ছেলেটির জ্ঞান ফিরে এলেও ঝুঁকি ছিল সম্পূর্ণ স্বাভাবিক থাকবে কিনা। পুলিশ শেষ পর্যন্ত ছেলেটির বাবার অনুরোধে জামাল চৌধুরীকে ছেড়ে দেয়।

কামাল থাকবে পাঁচ সপ্তাহ, ডিসেম্বর-জানুয়ারির মাঝখানের পাঁচ সপ্তাহ। সব হিসেব করে জামাল চৌধুরী অফিসে তার পাওনা ছুটির সঙ্গে আরও এক সপ্তাহ বেশি ধরে মোট চার সপ্তাহের জন্য আবেদন করে। আশফাক খান ছুটির কথা জানতে পেরেই জামাল চৌধুরীকে ডেকে নিজের ঘরে নেয়, কোথায় যাচ্ছেন, এত লম্বা ছুটির কেন দরকার হলো ? জামাল চৌধুরী চট্ করে কামালের কথা না বলে চুপ করে থাকে। আশফাক খানই বলে, ভাবিকে নিয়ে কোথাও যান ভাল হবে, ঘুরে আসেন। আর কোনো উন্নতি হলো না, না ? জামাল চৌধুরী আশফাক খানের রুমে দেয়ালে টাঙ্গানো মানচিত্র, পারিবারিক ছবি, সার্টিফিকেট, অ্যাওয়ার্ডের বাঁধানো সার্টিফিকেটের ওপর চোখ বুলিয়ে দীর্ঘশ্বাস গোপন করে। তখন আশফাক খান হঠাৎ করেই বলে, কামাল ভালো আছে ? ও তো আসতেছে। জামাল চৌধুরী চোখ তোলে, চোখে বিস্ময়, কৌতূহলও – আপনি কেমনে জানলেন ? গতকালই কামালের চিঠি এসেছে। এর মধ্যে কারও সঙ্গে আলাপ হয়নি, সায়মা তো আর বলতেও পারে না, এমনকি আলী, আলীর মা জানলেও আশফাক খানকে তারা কোথায় পাবে ? অন্য আত্মীয়স্বজনদেরও সঙ্গে এক রাতের মধ্যে কথা হয়নি। আশফাক খান বলে, আপনার ভাই তো ভি.আই.পি., বিদেশে অবস্থানরত যুদ্ধাপরাধীদের নিয়ে ডকুমেন্টারি মেক করছে। আশফাক খানের ঠোঁটের পাশে বাঁকা হাসি। জামাল চৌধুরীর শ্বাস ঘন হলেও সম্ভব শান্ত চোখ তুলে আশফাক খানকে দেখে, ফর্সা গোল মুখে যত্ন করে ছাঁটা ফ্রেঞ্চকাট সোনালী দাড়ি, সোনালী ফ্রেমের গোল চশমা, সেনালী রঙ লাগানো পাতলা চুলে জেল অথবা ক্রিম দিয়ে পিছন দিকে পরিপাটি করে আঁচড়ানো। দাড়ি চুলে রঙ চড়াতে হলেও চিবুকে গলায় ভাঁজ নাই, সুর্মা রঙের সাফারি স্যুটের সঙ্গে মানানসই বাদামি জুতা। জামাল চৌধুরী আশফাক খানের গোলাপি মসৃণ চিবুক গলা দেখে হাতের মুঠা পাকায়, শিরশির করে, ইস যদি একবার ধরা যেত। আশফাক খান বলে, কামাল আমার ছোট ভাইয়ের মতো, হেল্প লাগলে বলবেন, চাইলে একটা ইণ্টারভিউ দিতে পারি ওর ডকুমেণ্টারির জন্য। জামাল চৌধুরী বলে, ঠিক আছে, আমি আসি ? না যাবেন না, বসেন, যাওয়ার হুকুম না দিলে তো যেতে পারেন না। আশফাক খানের চিবুক ঘিরে আনন্দের হাসি, শুনেন, কামালকে বলবেন, ভাবির ইণ্টারভিউ নিতে, কথা তো বলতে পারবে না, আ, উ, গোঙ্গানি রেকর্ড করে নিলে ওর ডকুমেণ্টারি বিদেশে পুরস্কার পাবেই। আপনার আইডিয়ার কথা কামালকে বলবো, বলে ঘর থেকে বের হয়ে আসে জামাল চৌধুরী।

অফিসে আর মন বসে না। বাসায় ফিরে কামালকে ফোন করতে হবে। সময়ের পার্থক্য এখন এগারো ঘণ্টা। দুপুরের আগে আগে করতে পারলে ভাল, মন্ট্রিয়লে তখন বেশ রাত, এখন না আসতে বলবে, আসলে এয়ারপোর্ট থেকেই দেশদ্রোহীতার রাষ্ট্রীয় অভিযোগে গ্রেপ্তার হতে পারে। না হলে আরও বিপদ হতে পারে। তখন খড়ি ঘরের খবর মিলিটারিকে দিতে না পারলেও এখন তো ভুল হবে না। তথ্য প্রবাহের এমন আধুনিক যুগ যে না চাইতেই তথ্য নিজে এসে রাষ্ট্র করে যায়। জামাল চৌধুরী বাসায় আসতে পারে না। অফিসও করে না। অনেক দুর হেঁটে রমনা পার্কে এসে বসে থাকে। বাদাম, চা, সিগারেট, চুয়িংগাম, ফেরিওয়ালার সঙ্গে দুটি কিশোর এসে শরীরের মালিশের আব্দার করে, স্যার মালিশ কইরা দিবো, আরাম পাবেন। জামাল চৌধুরী লুঙ্গি, হাফ হাতা শার্ট পরা, মাথায় মুখে তেল মাখা, পাতলা গড়নের দুটি কিশোরকে দেখে কৌতূহল বোধ করে। পার্কে এর আগে সে মালিশের আমন্ত্রণ পায়নি। জামাল চৌধুরী বলে, তোদের রেট কত ? স্যার, সে আফনার ইনসাফ, কিছু না দিলেও পারেন। আফনি ওই ঝোপের পাশে আসেন, আরাম কইরা দেই। জামাল চৌধুরী পকেট থেকে পাঁচ টাকা দিয়ে বলে, তোরা যা, আজকে মালিশ লাগবে না। ছেলে দুটি যেতে না যেতেই একপ্যাঁচে লালশাড়ি পরা চুল চোখ এলোমেলো ময়লা ময়লা একটা মেয়ে এসে দাঁড়ায়, ঠোঁটে চোখে কৃত্রিম হাসি ফোটায়, লাগবো নি? জামাল চৌধুরীর বুঝতে সময় লাগে না কি লাগার প্রয়োজনে মেয়েটি এমন ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে অর্থপূর্ণ হাসির কসরত করছে। আশেপাশে তাকিয়ে বলে, দিনের বেলা, কত মানুষ, পুলিশ এর মধ্যে তুমি কিভাবে লাগাবে ? মেয়েটি মজা পায়, কুনো পোরেবলেম নাই ক্যা, সব ফিট করা আছে, লাগবে নি কন, মারকেট ভালো না, রেট কোম রাহমনে। মার্কেট খারাপ কেন ? মারকেটের দোষ নাই ক্যা, মাগী বাইরা গেছেগো। কেন বেড়ে গেল ? দুর প্যাচাল রাহেন, বেশি কথা কওন কাস্টমার আমার পছন্দ না। কাস্টমারদের কতটুকু সময় দেও ? তাগো যতক্ষণ লাগে, আগে থিকা কওন যায় না, তয়, মর্দানি কমছে, এক দুই মিনিটেই কাম শেষ কইরা ক্যালাইয়া পরে, পরলেই ভালো কি কন, আমাগো সময় বাচে। জামাল চৌধুরী কৌতূহল বোধ করে, বলে, হাতে কাস্টমার না থাকলে মিনিট পাঁচ বসো, কথা বলি, তোমাকে দশ টাকা দিবো। মেয়েটি অবলীলায় হাঁটু ভাঁজ করে মাটিতে মুখোমুখি বসে বলে, কন কি কবেন, কত সাংবাদিগগো লগে কথা কইলাম, কিছু হয় না ভাই। জামাল চৌধরী বলে, এখন মর্দানি কমছে কেন জানো ? ব্যাটা কয় কি, আমি কেমায় কমু। তয় ধরেন যে, মনে লয়, তেমুন ভালোমন্দ খাইতে পারে না। আর তুমি ভালোমন্দ খাইতে পার ? আরে না, এহন ইনকামও কইমা গেছে, আবার উল্টা দিকে হইটেলগুলা খাবারের দাম চড়াই দিছে, কন ভালো খামু কেমায় ? তোমার দেশের বাড়ি কোথায় ছিল ? মেয়েটি একবার চোখ তুলে তাকিয়ে আঙুল খুঁটতে খুঁটতে বলে, ওই বৈদ্যের বাজার, আমাগো ঘরবাড়ি মেলা আগেই ম্যাঘনায় গিলছে। তোমার নাম। জামাল চৌধুরীর দিকে আবার তাকিয়ে বলে, পুর্ণিমা। জামাল চৌধুরী বুক কাঁপিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললেও পুর্ণিমার একবারও লম্বা শ্বাস ফেলার প্রয়োজন হয় না। জামাল চৌধুরী পুর্ণিমাকে ১০ টাকা দিয়ে উঠে পড়ে। ঘড়িতে এখন বেলা সাড়ে বারটা, দুপুর একটার মধ্যে বাসায় পৌঁছতে পারলে ভাল। কামালকে ফোনে পাওয়া সুবিধা হবে।

আশফাক খানের সব কথা শুনেও কামাল বলে, আমি আসব, এখন আমি এই দেশের সিটিজেন, সেরকম কিছু হলে বিষয়টা আন্তর্জাতিক নিউজ হয়ে যাবে। জামাল চৌধুরী খুব দুর্বল বোধ করে, জোর দিয়ে কিছুই বলতে পারে না। কামাল বলে, তুমি ভাইয়া অন্য কোথাও চাকরি করতে পার না ? দীর্ঘশ্বাস ফেলে জামাল চৌধুরী ফোনের মধ্যে চেঁচিয়ে বলে, ও তো হঠাৎ করে এখানে এসে ঢুকলো, বেশি শেয়ার কিনে নির্বাহী পরিচালক হয়ে বসল, আগে তো ও ছিল না, কোন ব্যাঙ্কে চাকরী করত। কামাল বলে, চিন্তা কইরো না। আমি দেখি একলা হলেও আসব, ভাবির শরীর কেমন ? একই রকম। শোন ভাই, এইবার তোরে ধরবার পারলে ছাড়বে না। কামাল বলে, তোমার শরীর কেমন এখন ? আছে, খালি হাতটা, কেমন নিয়ন্ত্রণ হারায় ফেলি, এত বছরেও কিছু হইলো না। এবার কামাল ফোনের অপর প্রান্ত থেকে লম্বা শ্বাস ফেলে। জামাল চৌধুরী বলে, জানিস, হাতটা কেমন শুকায় যাইতেছে, মনে হয় লম্বা হয়ে গেছে। কিন্তু শক্তি কমে নাই ! এখনও শক্ত করে ধরতে পারি রে। টেলিফোনের অপর প্রান্তে কামালের কেমন গা কেঁপে ওঠে, গলায় মৃদু আতঙ্কের আঁচড় চিড়বিড় করে, থাক, আর শক্ত করে ধরতে যেও না। জামাল চৌধুরী কাঁপে, কেন কেন ধরব না। একশবার ধরব, হাড্ডি মাথা গুড়িয়ে

ফেলব দেখিস। কামাল কথা না বলে চুপ থাকে, কেন যেন তার চোখে পানি চলে আসে। গলাতেও পানি এসে জমে, কথা বলতে গেলে পানির সঙ্গে সংঘর্ষ বেধে কথা কেমন বেজে উঠবে। তার থেকে কিছু সময় চুপ থেকে নিজেকে গুছিয়ে নেয়া ভালো। জামাল চৌধুরী তখন বলে, ডকুমেন্টারিতে তোর ভাবিকে তুলিস, কথা তো বলতে পারবে না, গোঙ্গানির ধ্বনি কথার থেকে বেশিই হবে। কামাল তবুও চুপ থাকে। ভাবির শেষ আর্ত চিৎকার কামালের কানে এসে আছড়ে পড়ে, কামাল তুমি পালাও, তুমি পালাও। পালাতে পারলে হয়তো ভাবি বাকশক্তি হারাতো না, সম্মান এবং সম্মানের সম্ভাবনাও এইভাবে নষ্ট হতো না, কামাল তুমি পালাও, তুমি পালাও।

কাঠাল বাগান ফ্রি-স্কুল স্ট্রিটের মেহের"ন্নেসা স্কুলের পাশে কচুরিপানা ভর্তি বড় একটা পুকুরের পারে জামাল চৌধুরীর ভাড়া বাসা থেকে কামাল পালাতে পারে না। জানালার পর্দা সরিয়ে, পিছনের দরজা দিয়ে দেখে চারিদিকে মিলিটারি, সঙ্গে থুতনিতে গোছা গোছা দাড়িওয়ালা কয়েকটা রাহেবার – পথপ্রদর্শক। টুপি মাথায় আশফাক খান পাক মেহমানদের খোশ আমদেদ জানানোর জন্য দরজা খুলে অপেক্ষা করছে। আসর ওয়াক্তের শ্যামলা বেলায় বিবর্ণ জামাল চৌধুরী সায়মাকে কোলে তুলে কামালকে নিয়ে এক চিলতা উঠানের শেষে মুখ থুবড়ে পড়ার অপেক্ষায় থাকা খড়ি ঘরে এসে ঢোকে। খড়ি, পাটখড়ি, আরও কি কি ভরে রেখেছে বাড়িওয়ালা আশফাক খান, তার ভিতর ছায়া অন্ধকারে মিশে দমবন্ধ করে সেঁধিয়ে থাকে। সকাল থেকেই সায়মার ব্যথা উঠেছে, ব্যথা তেমন জোরালোও নয়, পানি ভেঙ্গেছে কিনা সায়মা বলতে পারে না, খালি গুড়গুড় ব্যথা, তলপেটে চাপ, বা"চা যে অনেক নেমে পড়েছে প্রথম মা হতে যেয়েও সায়মা বোঝে। জামাল চৌধুরীর হাত পেটের ওপর চেপে ধরে বলে, দেখো কেমন নড়তেছে, মনে হয় আর ভিতরে থাকতে চায় না। অনেকভাবে চেষ্টা করে একজন দাই-এর খবর পাওয়া গেছে। সে রাতের আগে এসে পৌঁছতে পারবে না, তারপর যদি কারফিউ শুর" হয়ে যায়, তাহলে আগামী কাল সকালের আগে না। জামাল চৌধুরী পায়চারি করে, টেনশনে তার মুখে কথা তোতলায়। একবার আশফাক খানকে বলে এসেছে, সায়মার ব্যথা উঠেছে, হাসপাতালে নেয়ার ব্যবস্থা করা যায় কিনা। আশফাক খান গম্ভীর, তার কথা মেনে জামাল চৌধুরী কাজ করবে না, উপরন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া ভাই কামাল হঠাৎ করে গায়েব হয়ে গেছে। গায়েব হয়ে যে দুষ্কৃতিকারিদের সঙ্গে মিশেছে এ-ব্যাপারে সে নিশ্চিন্ত। আজ সকালে আবার এই দুষ্কৃতিকারী কামালকে বাসায় দেখা গেছে। আশফাক খান বলে, ব্যথা উঠলে বা"চা হয়ে যাবে, হাসপাতালে গেলেও তাই হবে। জামাল চৌধুরী তোতলায়, আমরা তো কিছু বুঝি না, ভাবি কি একটু দেখে আসবে। আশফাক খান বলে, আমি বলে দেখব, কামালকে বাসায় দেখলাম মনে হয় ! জি, ও দেশের বাড়িতে আব্বা আম্মার কাছে গেছিল। আম্মা পাঠাইছে সায়মাকে নিয়ে যেতে। এই অবস্থায় কেমন যাবে কন। আশফাক খান পাঞ্জাবির সোনালী বোতাম লাগায়। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চোখের নিচে যত্ন করে সুর্মা টেনে দেয়। ঘন চাপ দাড়ি চিবুকের সঙ্গে সাঁটা, কালো মিসমিসে দাড়িতে চির"ণি বুলিয়ে এনে কি যেন একটা দোওয়া পড়ে। জামাল চৌধুরীর উপস্থিতি সে গ্রাহ্য করছে না, কথাও নয়।

সায়মার ব্যথা তিরতির করে বাড়ে, কপালে ঘাম। জামাল চৌধুরী পাশে হাত ধরে বসে থাকে, পেটে কপালে হাত ডলে দেয়, কামাল পাশের ঘরে পায়চারি করে। জামাল চৌধুরী বলেছিল বাড়িওয়ালা খান যেন তাকে না দেখে। এত অল্প পরিসরের ভিতর কখন দেখে ফেলে কে জানে, অথবা আশফাক খান এদিকে চোখকান মেলে অপেক্ষা করে থাকে কখন কি ঘটে, কে আসে, দুষ্কৃতিকারী ভাইটা যোগাযোগ করে কিনা। পাক মোটরের সামনে ছোট একটা অপারেশনের দায়িত্ব নিয়ে কামাল ঢাকায় ফিরেছে দুইদিন, আজই এসেছিল বিশেষ করে ভাবিকে দেখে যেতে, গ্র"পের অন্য পাঁচজন এলিফেন্ট রোডে দুই তিন বাসায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। গাড়ির আওয়াজ শুনে জানালার পর্দা ফাঁক করে কামাল জামাল দেখে দুটি মিলিটারির জিপ মেহের"ন্নেসা স্কুলের সামনে। কামাল মুহুর্তে বুঝে ফেলে এলাকা ঘিরে আছে মিলিটারি, পালাবার পথ আর থাকে না। সায়মাও আসন্ন বিপদের টের পেয়ে ব্যথার সঙ্গে আর্তধ্বনি তোলে, কামাল তুমি পালাও, তুমি পালাও। জামাল চৌধুরী কিছু বুঝতে না পেরে সায়মাকে কোলে তুলে নিয়ে তখন খড়ি ঘরে ঢোকে। কি কারণে মিলিটারির দল আশফাক

খানের ঘরে বসে একটু সময় নিয়ে জামাল চৌধুরীর ঘরে ঢোকে, চৌকির তলে না দেখেই সেমি-মেশিনগানের নল ঘুরিয়ে অনবরত ট্রিগার চেপে যায়, বিছানা বালিশে বেয়োনেট দিয়ে খোঁচায়, উঠানে উঁকি দিয়ে দরজা খোলা ভাঙ্গা খড়ির ঘর দেখে। খুব বেশি হলে পঁচিশ হাত দুর। তখন সায়মা নিজেই নিজের মুখে হাত চেপে ধরে ব্যথার কাতরধ্বনি রোধ করে, শক্ত করে চেপে ধরে, দম বন্ধ হবার মতো অবস্থা। অসহ্য যন্ণার স্রোতে রক্ত বেরিয়ে আসে, রক্তের সঙ্গে আরও ময়লা বিজলা বিজলা কিছু। বা"চার মাথার চাঁদির অনেকটা এসে গেছে। জামাল চৌধুরী কামালের দিকে তাকিয়ে মরিয়া হয়ে বা"চার মাথা চেপে ধরে, আর একটু ভিতরে থাক বাবা, আর একটু। মায়ের গর্ভ থেকে মাথা বের করেই তো বিস্মিত ভয়ার্ত শিশু চিৎকার করে উঠবে। এই চিৎকার ঠেকাতেই জামাল চৌধুরী সায়মার দুই পা ফাঁক করে নিজের শক্ত চওড়া হাত দিয়ে বা"চার মাথা চেপে ধরে। গায়ের শক্তিতে ঠেসে আবার মায়ের জরায়ুতে ঢুকিয়ে দিতে চায়। বাবা আর একটু অপেক্ষা কর। জামাল চৌধুরীর মতো সায়মাও নিজের মুখ চেপে ধরে রেখে প্রসব যন্ণার সকল কাতরধ্বনি বন্ধ করে রাখে। সায়মা ওই অবস্থায় কখন জ্ঞান হারিয়ে ফেলে জামাল চৌধুরী বুঝতে পারেনি। মাগরিবের আজানের সময় নিথর সায়মার প্রসব-মুখ থেকে হাত সরিয়ে আনে, বা"চা আর ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায় না, সায়মাও নিশ্চুপ। হতবিহ্বল জামাল চৌধুরী বলে, কামাল, এ কি হইলো। দাঁতে দাঁত চেপে কামাল বসে বসে কাঁপে আর চোখ দিয়ে অনর্গল পানি গড়ায়, নড়ে না, উঠে না। জামাল চৌধুরী সায়মাকে ওই অবস্থায় কোলে তুলে ঘরে এনে বিছানায় ফেলে। তখন কালো বোরখায় জড়িয়ে মাখনের মা দাই আসে। দাই এক নজর দেখেই বলে, হায় হায়, বা"চা তো নাই, বা"চা তো নাই। মাখনের মা দাই'র গলায় হাহাকার। হাসপাতালে একদিন পর সায়মার জ্ঞান ফিরলেও মুখে কথা ফিরে না।

কামালের ফোন রেখে জামাল চৌধুরী নিজের হাত দেখে, গন্ধ শুঁকে, গরম ভিজা ভিজা, মিহি আঁশের স্স্লর্শ হাতের তালুতে শিরশির করে, শরীর শিহরিত হয়।